Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-II, January2022, Page No.68-79
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নিউরোহিস্ট্রি: বাঙালি ও সিংহলি জনসমাজের মধ্যে জিনগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক সাদৃশ্য সমূহের একটি মূল্যায়ন

Dr. Sandip Dutta
Clemson University, USA
Ms. Madhumita Dutta
Assistant Teacher of History, Kolkata, India

Abstract:

Bengal region and the island of Sri Lanka share several genetic roots that have been proven by scientific studies involving these two populations. Since genes contribute to the development of behavior and immediate reflexive responses, the traits that govern the flow of history and the development of civilization are influenced by the genes. This work compares similar aspects of history between Bengal and Sri Lanka. Historical events are categorized as Political, Diplomatic, Cultural, Social, Economic, and Intellectual history. Both regions suffered from king-to-king in-fighting and showed a tendency to betray for personal gains. The Naxal movement and Tamil tiger movement or revolts against the ruling systems are also notably similar. The cultural similarities can be found in the dance constumes with large masks and layered colored clothes worn by the "chhou" and "devil" dancers of these two regions. The response of these two civilizations on the British invasion were strikingly similar. To fight the British rulers, both regions supported the help from Japan, while the rest of the Indian subcontinent did not support Japan's involvement or fighting with arms. History does get influenced by the local events and local differences, but the similarities observed between these two geographically disconnected regions are noticeable and can perhaps only be explained by the behavioral traits formed from genetic similarities, which is also known as Neurohistory.

Keywords: Neurohistory, Historical Similarities, Bengal, Sinhalese, Sri Lanka, Genetics

ভূমিকা: বাংলা এবং সিংহলের (বর্তমান শ্রীলংকা) অধিবাসীদের ইতিহাস অন্বেষণ করলে প্রভূত মিল চোখে পড়ে। এই দুই জনসমষ্টিতে জিনগত সাদৃশ্যও রয়েছে বলে অনেক গবেষক তাদের মত ব্যক্ত করেছেন। আমরা এই প্রবন্ধে জিন তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে একটি হাইপোথিসিস দাঁড় করানোর প্রয়াস নিয়েছি, যা ইতিহাস থেকে আহরিত জ্ঞানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দিক নির্ধারণ করবে এবং সেইসঙ্গে ইতিহাসের একটি নতুন দিক নিয়েও আমরা এখানে আলোচনা করবো যার ইংরিজি নাম 'নিউরো হিস্ট্রি'। সাধারণতঃ ইতিহাস বলতে বোঝায় অতীতের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ, প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে সেই পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির বিশ্লেষণ এবং তার সত্যতা যাচাই করা। কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে নিরন্তর ঘটে চলে যেমন, 'প্রাকৃতিক ইতিহাস'। কিন্তু তা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এই প্রবন্ধে আমরা ইতিহাসের সেই দিক নিয়ে আলোচনা করব যা মানুষের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। 'নিউরো হিস্ট্রি' একটি আন্তঃবিষয়ক চিন্তাধারা, যা স্নায়ুবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে বিবেচনা বা বিশ্লেষণ করে। মানুষের ব্যবহারিক

আচরণ আংশিকভাবে জিন ঘটিত কারণে নিয়ন্ত্রিত হয়। Thiessen [1] মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে জিনের প্রভাব সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন এবং তা করেছেন সেই 1971 সালে। তারপর মানুষ এবং পশুপক্ষীর ওপর এই বিষয়ে আরো গবেষণা হয়েছে যার ফলে ব্যবহারের উপর জিনের প্রভাব সংক্রান্ত তত্ত্ব আরো সুদৃঢ় হয়েছে। এটা সত্য যে, মানুষের আচরণ শুধুমাত্র জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরং কিছুটা পরিস্থিতি এবং কিছুটা প্রাপ্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেও গড়ে ওঠে। তাহলেও মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলস্বরূপ যে ইতিহাস গড়ে ওঠে, তাতে জিনের প্রভাব পড়তে বাধ্য। যদি তা অংকের নিয়ম মেনে দুয়ে দুয়ে চার করা একরকম অসাধ্য। আমাদের প্রবন্ধে এমন দুটি জাতিগত গোষ্ঠী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যাদের জিনগত গঠন একই ধরনের যেমন, বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ একত্রে) এবং শ্রীলঙ্কা। এই দুই অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে জিনগত সংমিশ্রণের মিল একটি বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর থেকে কি অনুধাবন করা যায় যে এদের মধ্যে ইতিহাসগত সাদৃশ্য বর্তমান? জিনের সংমিশ্রণ মানুষের ব্যবহারের ওপর প্রভাব ফেলে; মানুষের চরিত্র এবং স্নায়ু জনিত ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়ার উপর ব্যক্তিবিশেষের জিনের মিশ্রণের প্রভাব আছে। তাই কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির জিনের প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। এই প্রবন্ধ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংগ্রহ রবং তা বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছে, যে পথ অনুসরণ করে মানুষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাতে জনগত সাদৃশ্য কতটা রয়েছে।

শ্রীলংকার অধিবাসীরা কোথা থেকে এসেছিল তার বৃত্তান্ত পাওয়া যায় US কংগ্রেস লাইব্রেরির [2] পর্যবেক্ষণে, যেখানে বলা হয়েছে, উনিশ শতক থেকে শ্রীলঙ্কায় চারটি বিশিষ্ট জাতিগোষ্টীর প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী সিংহলিদের অভিপ্রয়াণ ঘটেছে ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে প্রায় 500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। Metspalu এবং অন্যান্যরা [3] মনে করেন যে এর কিছুকাল পরে ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিকবার বহিরাক্রমণ ঘটেছে এবং সবগুলি আক্রমণই ঘটেছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। ফলে উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার দরুন বাংলাসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন তুলনামূলকভাবে নিরপদ্রুব এবং শান্তিপূর্ণ ছিল। Josh [4] ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব চিহ্নিত করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে বাংলা অঞ্চলের বংশানুক্রমিক জনসমষ্টি একটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

Reich এবং অন্যান্যদের [5] মতে মানবজাতির পরিবর্তনশীলতা ও ভিন্নতার জিনোম ভিত্তিক সমীক্ষার নিদর্শন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় ভারতবর্ষে বেশ স্বল্প। বর্তমান ভারতবাসীর অধিকাংশই যে জিনগত ভিন্নতা সম্পন্ন দুটি প্রাচীন জনসমষ্টির বংশানুক্রমিক ধারা, তার স্বপক্ষে প্রমাণ সরবরাহের জন্য তারা 25টি বিবিধ গোষ্ঠীর বিশ্লেষণ করেছেন। এর মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে আদি উত্তর ভারতীয়দের সম্পর্কে, যারা প্রকৃতপক্ষে জিনগতভাবে মধ্যপ্রাচ্য, মধ্যে এশীয় এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। অপরটি হল আদি দক্ষিণ ভারতীয় বংশানুক্রমিক ধারা, যারা উত্তর ভারতীয় এবং পূর্ব এশিয়দের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। একটি সূচক কার্যপ্রণালী মাধ্যমে ভারতীয়দের সঠিক (সংমিশ্রণ ঘটেনি এমন) পুরুষানুক্রমিক হয়েছেন ভারতবর্ষে আদি উত্তর-ভারতীয় বংশধারায় উপস্থিতির হার অঞ্চল বিশেষে শতকরা 39 থেকে 71 ভাগ। সমাজের ঐতিহ্যগত উচ্চবর্ণের মধ্যে এরা আবার ঊর্ধ্বতন এবং সম্পূর্ণভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষী। অন্যদিকে আদি দক্ষিণ- ভারতীয় বংশধারার গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব ভারতের মূল ভূখণ্ডে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যদিও বৃহত্তর আন্দামানবাসী, যাদের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় বংশধারার কোন সম্পর্ক ছিল না, কেবল দক্ষিণ ভারতীয় বংশধারার সঙ্গেই যারা সম্পর্কযুক্ত ছিল, তারা ভারতীয় মূল ভূখণ্ডে উপরিল্লিখিত বিদেশী বংশধারার আগমণের পূর্বেই আন্দামানের দ্বীপগুলিতে তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল।

ইতিহাস মানে কি সুদূর প্রাচীনকালের বৈদিক যুগ বা পৌরাণিক যুগের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা? আধুনিক গবেষকরা কিন্তু তা মনে করেন না। অতীত সভ্যতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন, তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের পথনির্দেশিকা রচনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই প্রাচীন শিক্ষাকেই তারা সম্পূর্ণ বলে মনে করেন না, কারণ তাদের হাতে বিভিন্ন তথ্যপঞ্জী উপলব্ধ, যা দিয়ে তারা শিক্ষা জগতের নানাবিধ বিষয়গুলির মধ্যে বিদ্যমান যোগসূত্রগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করে সংগৃহীত নতুন তথ্যাবলীর মাধ্যমে ইতিহাসের যুগোপযোগী বিশ্লেষণ করেছেন যা নিঃসন্দেহে লক্ষণীয় বিষয়। New York বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Renwick [6] এর গবেষণার বিষয়বস্তু হল জীব-বিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞান থেকে কিভাবে ইতিহাস গড়ে ওঠে তার অনুসন্ধান। বিষয়টি সহজসাধ্য নয় এবং আমরা কোন ছকে বাঁধা নমুনা খোঁজার চেষ্টা করিনি। তবে পরিস্থিতি সাপেক্ষে আমাদের মধ্যে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ঘটে তা অবশ্যই জীবতত্ত্ব এবং সামাজিক প্রভাব থেকেই নির্ধারিত হয়। যেমন মাথায় লাঠির বাড়ি পড়লে, পালাবো না প্রত্যাঘাত করব তা আসে তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তি থেকে যা প্রধানত জিনের প্রভাবেই ঘটে এবং এই ব্যবহারের পার্থক্য ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ পাল্টে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। সমাজবিজ্ঞানের উপর আন্তঃবিষয়ক প্রভাব সম্পর্কে Sherpa এবং অন্যন্যরা [7] তাদের গবেষণায় আলোচনা করেছেন উচ্চশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে আন্তঃ বিষয়কতার অগ্রগতি 3টি মাত্রার উপর নির্ভর করে। এগুলি হল যথাক্রমে-

আন্তঃ বিষয়ক শিক্ষাসংক্রান্ত মাত্রা: নানা দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রেক্ষাপটে কঠিন বা জটিল বিষয় শিখনকালে কোন সমস্যা সমাধানে যুক্তি কেন্দ্রিক গবেষণা ভিত্তিক পঠন- পাঠনের শিক্ষা। একটা বিশেষ বিষয় অথবা বিশেষ সমস্যা সমাধান করার ওপর ভিত্তি করে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা, শুধু জানার জন্য জানা নয়।

শিক্ষাসূচি ভিত্তিক মাত্রা: এমন পাঠ্যক্রমের বাস্তবায়ণ যা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আন্তঃবিষক অগ্রগতির বিষয়টিকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। সমস্যা সমাধানভিত্তিক শিক্ষাকে মজবুত করতে হলে সেই বিষয়ে প্রযোজ্য উদাহরণের মাধ্যমে তা প্রয়োগ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা: যুক্তিভিত্তিক গবেষণাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে লাভ-লোকসান ব্যতিরেকে ঝুঁকি নেওয়ার প্রতি সমর্থন এবং সাংগঠনিক সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেই ভবিষ্যতের দিক নির্ণয় করা, বিষয় নির্বাচনে অগ্রাধিকার এবং সাংগঠনিক সমন্বয় করাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

এইসকল গবেষকদের লেখা পড়লে বোঝা যায় যে শিক্ষা হল প্রকৃতপক্ষে একটি সমস্যা সমাধানের যন্ত্র। সময়ের সঙ্গে যেমন সমস্যা বদলায়, শিক্ষার ধারাও সেই রকম বদলাতে হয় যাকে অভিযোজন বলে। কোন পথে এই অভিযোজন ঘটবে সেটা প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন ঠিক করে। পরবর্তীতে সেই নির্দেশনাগুলো শিক্ষক ছাত্রদের শেখান এবং ছাত্ররা তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এইসব স্তরে যে ব্যক্তিগত সান্নিধ্য থাকে তাতে জিনগত প্রভাব আসে। একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বিভিন্ন দেশের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া করে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ায় জিনগত প্রভাব থাকে এবং সেটাই এখানে আমাদের আলোচ্য। গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নিউরো-হিস্ট্রি উৎসাহজনক হলেও পাশাপাশি তুলনা করার মতো তথ্য পাওয়া বেশ কঠিন। সমষ্টিগতভাবে বাঙালি ও সিঙ্ঘলীদের মধ্যে আমরা কিছু জিনগত এবং ঐতিহাসিক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি যা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

Moorjani এবং অন্যান্যদের [8] রচনায়, সংমিশ্রণ ঘটেছে এমন ভারতীয় জনসমষ্টির একটি বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, দুটি মিশ্র বংশধারার জনসমষ্টি থেকে অধিকাংশ ভারতীয় গোষ্ঠীর অবতরণ ঘটেছিলো। এর মধ্যে উত্তর ভারতীয় বংশধারা মধ্য এশিয়, মধ্যপ্রাচ্য, ককেশীয় এবং ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় বংশধারা ভারতীয় কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রূপে সম্পর্কযুক্ত নয়। সংমিশ্রণের সময়লিপি অজানা কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস বোধের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। নিম্নে ভারতীয় উপমহাদেশে জিনগত সংমিশ্রণের উল্লেখ করা হলো।

নেগ্রিটো- কেরালা;
প্রোটো- অস্ট্রালয়েড- মধ্যভারত- সাঁওতাল, ভীল, গণ্ড, মুণ্ডা, ওরাওঁ;
মঙ্গোলয়েড-লাদাখ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ;
ভূমধ্যসাগরীয়- দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ভারতের বৃহদাংশ;
নর্ডিক বা আর্য-পাঞ্জাব, হবিয়ানা, রাজস্থান, জম্মু,;

বাঙালিরা ইন্দো-আর্য হিসেবে বিবেচিত হয়, খুব সম্ভবত আর্য এবং প্রোটো-অস্ট্রালয়েডদের একটি সংমিশ্রণ। Papiha ও অন্যান্যরা। [9] এবং Kshatriya [10] নিরীক্ষণ করেছেন, সিংহলিদের জিনগত রূপরেখার 25% বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ লক্ষণ বাঙালিদের জিনগত সমন্বয় এর অনুরূপ। আরো বিশদভাবে করা একটি জিনগত পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, তাদের উপর বাঙালি জিনের প্রভাব 70% এর বেশি। আমাদের প্রবন্ধের পরের অংশে দুই অঞ্চলের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে যে, ভারতে যখন ইংরেজদের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন প্রদত্ত কোন পরিস্থিতিতে ইংরেজ সাহেবদের ব্যবহার ও প্রতিক্রিয়া স্বদেশীদের থেকে অনেক আলাদা ছিল। ইংরেজরা সকলেই যে শিক্ষিত বা শিক্ষা না পেলেও কঠিন সমস্যার মধ্যে পরলে যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তার মধ্যে সাদৃশ্য ছিল এবং সেটা অবশ্যই জিন থেকেই আসে। স্থানাভাবে এখানে ইংরেজদের জিন বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব হলো না।

বাঙালি এবং সিংহলিদের ইতিহাস বিষয়ক সাদৃশ্য:

মানুষের অবদানে গড়ে ওঠা ইতিহাসকে বিস্তৃতভাবে ছয় ভাগে ভাগ করা যায় [11] যেমন- রাজনৈতিক ইতিহাস, কূটনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস। এখানে আলোচ্যে বিষয়বস্তু হল ইতিহাসের এই ছয়টি ভাগ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

রাজনৈতিক ইতিহাস: বহিরাগত ব্রিটিশ শাসকবর্গ বাংলা এবং শ্রীলঙ্কা উভয়ের ক্ষেত্রেই একই ধরনের শাসন কৌশল অনুসরণ করেছিল। বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনপূর্বের অতীতে সেখানের বেশিরভাগ এলাকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজার শাসনাধীন ছিল। শ্রীলঙ্কাও এর ব্যতিক্রম নয়, এই ক্ষুদ্র দেশটিও সাম্প্রতিক অতীতের অধিকাংশ সময় একাধিক শাসকের অধীনে খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই সকল রাজাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। শ্রীলংকার ইতিহাসে বর্ণিত অনুরাধাপুরের রাণী অনুলার বিষ প্রয়োগ করে একাধিক রাজার হত্যার ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এদিকে মহারাজা শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম শাসক হিসেবে বাংলার বৃহদাংশ শাসন করেছিলেন। তাঁর শাসনকালের বিভিন্ন ঘটনাবলী যা লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে এই সময় শাসকবর্গ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও হত্যাকাণ্ডেই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন। বাংলা এবং শ্রীলঙ্কা উভয়ের কাছেই তাদের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ ছিল, কিন্তু সেখানের শাসকবর্গ রাজনীতির যে পথ অনুসরণ করেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে নিজেদের অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখতেই তারা অধিক সক্রিয় ছিলেন, ভবিষ্যত উন্নয়নের পরিকল্পনার বিষয়টিতে তাদের উদাসীনতাই লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমে ধরা যাক শ্রীলংকার কথা। বাঙালি পাঠকদের কাছে বাংলার ইতিহাস অনেকটাই জানা, কিন্তু শ্রীলংকা সম্বন্ধে তারা ততটা অবগত নাও থাকতে পারেন; তাই শ্রীলংকার কথা তুলনামূলকভাবে বেশি আলোচনা করা হলো। Attanayake [12] র লেখা থেকে জানা যায় কিভাবে সামুদ্রিক রেশম পথের যুগ থেকেই বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেছিল এবং ভারত মহাসাগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান এর দরুন শ্রীলংকা বাণিজ্যিক যাত্রাপথের অবশ্যম্ভাবী বিরতি স্থল হয়ে উঠেছিল। সুদূর প্রাচ্য থেকে বঙ্গোপসাগর বা লোহিত সাগর বা পারস্য উপসাগর অতিক্রমের সময় চিরকাল ভ্রমণার্থীদের কাছে শ্রীলংকা ছিল 'মধ্যস্থলে অবস্থিত সুরক্ষিত দ্বীপ', যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে যাত্রাকালীন বিরতির নির্দেশ দেওয়া হত। শ্রীলংকা সুবিস্তৃত সামুদ্রিক বাণিজ্যিক জালের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং রোমান ও চীন দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি অবস্থিত হওয়ার জন্য বৈশ্বিক নৌ চলাচলের ক্ষেত্রে এর ভৌগোলিক অবস্থানের সুফল ভোগ করতে পেরেছিল। নিরক্ষরেখার 5 থেকে 10 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে শ্রীলংকার অবস্থান। প্রাচীন রেশম যাত্রাপথে চীন এবং রোমান ও চীন দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সময় বাণিজ্য সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছিল, মান্নাই (মান্নার এর উত্তরে) এবং গোকন্ন (ত্রিঙ্কমালির পূর্ব দিকের বন্দরনগরী) বিশ্রাম এর উপযোগী দুটি প্রধান বন্দর হিসেবে কার্য সাধন করেছিল [13]। এমনকি সপ্তদশ শতকে যখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীতার মুল রণক্ষেত্রটি আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগরে স্থানান্তরিত হয়, তখনও শ্রীলংকার উত্তর-পূর্ব উপকূলের সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে গোকন্ন (ত্রিঙ্কোমলী) এর গুরুত্ব একই রকম ছিল [13]।1800 খ্রীঃ থেকে বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বৃটেনের প্রাধান্য বিস্তার ওই অঞ্চলের শক্তি কাঠামো বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, সেই সময় থেকেই ইংরেজরা বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দেশগুলিকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন একটি একক সত্তায় পরিণত করে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান সংঘবদ্ধ করেছিল। ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী সময়কালে ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর নিয়ন্ত্রণ করার উপযোগী শ্রীলংকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ব্রিটিশদের ত্রিঙ্কোমালী দখলের বিষয়ে আকৃষ্ট করেছিল। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনকালে ব্যাপী নিরাপত্তার প্রশ্নে ত্রিঙ্কোমালীকেই ব্রিটিশরা অনুকূল স্থান বলে মনে করেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এই ত্রিঙ্কোমালী বন্দরনগরী নৌঘোঁটি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে চিন এবং জাপান একাধিক অর্থনৈতিক সংযোগকারী পথের প্রস্তাব দিয়েছে, যাতে সেখানকার স্বল্পমূল্যের উৎপাদন সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখে। উদাহরণে হিসেবে বলা যায়, চিন এক অর্থনৈতিক পথের উন্নয়ন এর প্রস্তাব দিয়েছে, যেখানে ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং চিন [BCIM] এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একটি পথ বানান হবে, যা কলকাতা এবং চীনের য়ুনান প্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হবে এবং দক্ষিণ চীনের প্রদেশগুলিকে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত করবে। জাপানের প্রস্তারিত সংযোগ স্থাপনকারী পথটি দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে বাংলাদেশে-মায়ানমার হয়ে বঙ্গোপসাগর পার করে ইন্দোচীন হয়ে দক্ষিণ চীনসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। শ্রীলংকা এই চীন-জাপান প্রস্তাবিত উচ্চমূল্য সম্পন্ন সংযোগকে আরও সুদৃঢ় করে অর্থনৈতিক বিকাশের বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হতে পারত। এই তথ্যগুলো থেকে জানা যায় যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রগতিশীল বিভিন্ন জাতিগুলোর সঙ্গে সিংহলিদের ঘনিষ্ট যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা থাকলেও তারা নিজ উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি ঘটায়নি। বাংলাও অনেক সুযোগ সুবিধা অবহেলায় ফেলে দিয়েছে, এবং বাংলা মুলুকের সাথে শ্রীলংকার এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো।

কলকাতা এককালে ভারতের রাজধানী ছিল। যে কোনো নতুন সুযোগ অথবা উন্নয়ন প্রকল্প এখান থেকেই জন্ম নিত। কিন্তু বাঙালিরা সেই সুযোগে সদ্ব্যবহার করতে পারেনি এবং তা শুধু অদৃষ্টের ফলে ঘটেছে বললে ভুল বলা হবে, কারণ জিনগত সাদৃশ্যের ফলস্বরূপ সিংহলীদের মধ্যেও এই একই পরিণাম দেখা যায়। সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানের অধিবাসী হওয়ার দরুন সিঙ্ঘলিরা অনেক জাহাজের গমনাগমন এবং বাণিজ্যিক আদান প্রদানের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সত্বেও এই অভিজ্ঞতাকে তারা তাদের নিজেদের উন্নতির কাজে ব্যবহার করেনি, যা চীনারা করে থাকে। আজ মুম্বাই ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র, নতুন দিল্লি প্রধান শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র এবং হায়দ্রাবাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কেন্দ্র হিসেবে সর্বোৎকৃষ্ট। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কলকাতা বা বাংলারও এই সবকিছু হওয়ার প্রভূত সুযোগ ছিল, কিন্তু ব্যবহারিক কারণে তারা তার দখল নিতে ব্যর্থ হয়। এটা সমালোচনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে, এখানে আমরা যা বাস্তবে ঘটেছে তারই বিবরণ দিচ্ছি মাত্র।

Bharathi এবং অন্যান্যদের [14] মতে ভারতীয় নগরায়নের একটি আদর্শ অঙ্গীকার হল কৃষিক্ষেত্রে কঠোরভাবে বিদ্যমান পুরুষানুক্রমিক শ্রেণিবিন্যাসের সম্ভাব্য ভাঙ্গন। সুনির্দিষ্ট নগরায়নের সঙ্গে জড়িত আছে পরম্পরাগত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত দূরত্বের বাধা ভেঙে ফেলার প্রতিশ্রুতি। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জাতি এবং ধর্মীয় নথি সম্বলিত কর্নাটক শহরের একটি অনন্য জনসমীক্ষা ভিত্তিক তথ্যপঞ্জি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সেখানের নগরায়ণ এবং সমসাময়িক একটি ছবির মাধ্যমে নগরবসতির পৃথকীকরণের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক গুলি তুলে ধরা হয়েছে। তাদের প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ব প্রবল, বিশেষ করে বেঙ্গালুরু অঞ্চলে। সেই দিক থেকে বাংলা এবং শ্রীলঙ্কাতে জনবসতির পৃথকীকরণ কম। এখানের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ফলাফল লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষার মান বেশ ভালো। উল্লেখযোগ্য হলো শ্রীলঙ্কাতেও শিক্ষার হার খুবই ভালো এবং তা শুধু শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়।

ব্রিটিশদের বাংলা দখলের সময় মীরজাফরের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা বাংলার মানুষের অজানা নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো ব্রিটিশদের শ্রীলংকা দখলের সময়েও অনুরূপ একটি বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল। সেখানে কাণ্ডি সাম্রাজ্যে পিলিমাতালায়ুয়া নামে রাজার এক সহচর বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশদের জিতিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, যদিও মীরজাফরের মত তিনি তাঁর লক্ষ্য পূরণে সফল হতে পরেননি। এই দুই ঘটনা দুই জাতির সম চিন্তাধারার সমর্থক। এই ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা কি শুধুমাত্র ব্রিটিশদের কৌশল,

নাকি এর পিছনে আসল ভূমিকা গ্রহণ করেছে মানুষের জিনগত ব্যবহারের প্রবৃত্তি, সেটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা না গেলেও দুটি ঘটনার সাদৃশ্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়।

কূটনৈতিক ইতিহাস: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং পরিচালন সংক্রান্ত উপলব্ধি (Selverajah এবং অন্যান্যরা [15]) প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, তিনটি স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট, যথা-যত্ন লালিত সংগঠন, সুদক্ষ পরিচালনা এবং উৎকৃষ্ট নেতৃত্বের সঙ্গে আস্থা এবং ধারণক্ষমতার মতো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ প্রতিভাগুলিই নৈতিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই অধ্যয়নের তাৎপর্যপুর্ণ ইঙ্গিত হল যে, আস্থা, ধারণ ক্ষমতা এবং আনুগত্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি একটি জাতির অনুকরণ করা উচিত এবং নৈতিকতার উপর কম জোর দিয়ে ভালো পরিচালনার অনুশীলন করা উচিত, কিন্তু সেটা বাস্তবে সার্থক নাও হতে পারে, কারণ যে সময় নির্বাচন হয় সেই সময় মানুষ ঠিক কেমন কি ভাবছেন সেটাই পরিণামে প্রতিফলিত হয়। এই কারণে মানুষের জিনগত চিন্তাধারা নির্বাচনের ফলাফলে প্রভাব ফেলে।

আধুনিক বাংলায় বিশেষতঃ বাংলাদেশে মুসলিমরা সংখাগুরু হলেও এককালে ঐ সব স্থানে বৌদ্ধধর্ম বেশ জনপ্রিয় ছিল। বাংলার স্থানে প্রাপ্ত বৌদ্ধমঠ ও মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন মহান পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ঢাকা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীলঙ্কাতেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী মানুষের সংখ্যা প্রচুর। কে বলতে পারে, মুসলিম অনুপ্রবেশ না ঘটলে হয়তো বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয়তা পূর্বের ন্যায় অক্ষুণ্ণ থাকতো। খ্রীষ্ট-পূর্ব সময়কালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের যাতায়াত ছিল বাংলা এবং শ্রীলংকার মধ্যে।

Hossain [16] এর মতে বাংলাদেশের কূটনীতির উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে মহানাবিক বুধগুপ্ত চিটাগং থেকে মালাক্কা যাত্রা করেছিলেন এবং বাংলা ও মালাক্কার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মানুষ অতিথিবৎসল এবং কূটনীতিজ্ঞে সুকৌশলী। কূটনৈতিক নিপুণতা তাদের সহজাত অভ্যাস। বাংলা সহ অন্যান্য যে সব দেশে ফা-হিয়েন, ইবন বতুতা, র‍্যালফ ফিচ্ প্রমুখ পরিব্রাজক দূত হিসেবে ভ্রমণ করেছেন। চৈনিক সন্ন্যাসী পর্যটক ফা-হিয়েন, 400 খ্রিস্টাব্দ থেকে 411খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলার সোনারগাঁও সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত সোনারগাঁও তখন মসলিন বস্ত্র তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। মরক্কো নিবাসী মুসলিম লেখক ও পর্যটক ইবন বতুতো ভারতে আসেন 1334 খ্রিস্টাব্দে এবং 8 বছর ভারতে অতিবাহিত করেন। ভারতে থাকাকালীন তিনি সিলেট ও বাংলার সোনারগাঁও পরিভ্রমণ করেন। র‍্যালফ ফিচ্ একজন ব্রিটিশ অনুসন্ধানকারী, তিনি সোনারগাঁও পরিভ্রমণ করেন 1596 খ্রিস্টাব্দে। এইসব পরিব্রাজকদের রচনা থেকে দুই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যে বৌদ্ধধর্ম প্রীতি ছিল তা বোঝা যায়।

বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান 982 খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিক্রমপুর অধীনস্থ বজ্রযোগিনীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে বৌদ্ধ দর্শন প্রচারের মাধ্যমে তিব্বত এবং বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। শ্রীলঙ্কায় অবস্থানকালে দীর্ঘ অধ্যয়নের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। শ্রীলঙ্কায় অবস্থানকালে দীর্ঘ অধ্যয়নের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তিনি সম্যক উপলব্ধি এবং বোধ অর্জন করেন। তিব্বতের রাজা তাঁকে দুইবার আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে এই আমন্ত্রণ তিনি অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নেপাল হয়ে পায়ে হাঁটে 1041 খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে যান রাজা ব্যান চুব (Byan chub) এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। এইভাবেই অতীতে বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা এবং শ্রীলংকার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে।

স্বাধীনতার পর যখন ভারত বা পাকিস্তানকে সমর্থনের সময় আসে তখন বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকা দুদেশই পাকিস্তানকে বেছে নেয়। যদিও সেটা ঠিক হয়েছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক করার সুযোগ রয়েছে। স্বাধীনতার অল্প পরে শ্রীলংকা পাকিস্তানকে উড়োজাহাজের জ্বালানী দিয়ে সাহায্য করে, যাতে তারা বাংলাদেশে বোমা ফেলতে পারে। সমসাময়িক যুগেও দেখা যায় বাংলা এবং শ্রীলংকা আমেরিকা অথবা রাশিয়া বাদ দিয়ে জাপানকে বেশী পছন্দ করে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরিবরা অনেকসময় উন্নতিকে এড়িয়ে চলে। যেমন অ্যামাজন এর মতো বড় কোম্পানিকে নিউ ইয়র্কের অধিবাসিরা শহরে ঢুকতে দেয়নি। একই রকম যুক্তিতে বাংলার সিঙ্গুর এবং শ্রীলংকার হামবানটোতা এলাকায় উন্নতির বিপক্ষে রায় নেওয়া হয়। বলা হয় যে উর্বর জমি চাষের জন্য রাখা উচিত। যদিও জমির অভাবে খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা এখনও দেখা যায় নি।

রাজনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলা এবং শ্রীলংকার মনোভাবের প্রভূত মিল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার দেশপ্রেমী নেতা সুভাষ চন্দ্র বোস পরিকল্পনা করেছিলেন, ইংরেজদের শত্রু জাপানের সাহায্য নিয়ে এই দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাবেন। ভারতের বাকি অংশের বহু নেতা এই মতের বিরোধী হলেও বাংলা মানুষের আস্থা ও সমর্থন ছিল নেতাজির প্রতি। এখনো বাংলার জাতীয় মনীষী হিসাবে তাঁকে মর্যাদা দেওয়া হয়। আরও এক বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনিও ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে জাপানের সাহায্য লাভ করেছিলেন, বস্তুতঃ তিনিই আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার নেতাজির হাতে তুলে দেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শ্রীলংকার মনোভাবও অনুরূপ ছিল। জাপান এবং শ্রীলংকার কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেকদিনের এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে দুজন যুবনেতা জাপানের সাথে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশদের তাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন তারা হলেন J.R. Jayawardene এবং D. Senanayake। সিঙ্ঘলিরা এদের বিপুল সমর্থন জানায় এবং স্বাধীনতার পরে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। Mr. Jayawardene পরে শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসঃ এই প্রবন্ধে আমরা বাংলা এবং শ্রীলংকার মধ্যে যে ধরনের সাদৃশ্যের আলোচনা করছি তা উভয় স্থানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারায় বিদ্যমান। রাঢ় বাংলা এবং শ্রীলঙ্কায় ঐতিহ্যবাহী মুখোশ নৃত্যশৈলী সাংস্কৃতিক চর্চার অঙ্গ হিসেবে বহুল প্রচলিত। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ মুখোশের আড়ালে নৃত্য শিল্পীগণ তাদের নিজস্ব সত্তাকে সাময়িকভাবে সুপ্ত রেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সত্তাকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। আর এই ছদ্মবেশ ধারণের যন্ত্র হিসেবে উভয় সংস্কৃতিতে মুখোশ এবং বিশেষ ধরনের পোশাক ব্যবহারের রীতির যে সাদৃশ্য তা জিনগত সাদৃশ্যের ফলস্বরূপও ঘটে থাকতে পারে। দুই স্থানে মুখোশ নাচে মুখোশ এবং চরিত্রের উপযোগী পোশাক পরিধানের ভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতো। মুখোশ এবং পোশাকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে হয় মুখোশগুলি হল বৃহদাকৃতিরও পোশাকগুলি হাত-পা ঢাকা, গাঢ় রঙের একাধিক স্তরযুক্ত। সাধারণতঃ মুখোশ নৃত্যের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যগত এবং ধর্মীয় বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়, যা মানুষের মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। এই নৃত্য কখনও উৎসবের মরশুমে আনন্দ উপভোগের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, আবার কখনও অশুভ প্রভাব বা রোগ ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আচার পালনের উদ্দেশ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয় [17]।

বাংলার ছৌ নাচের মতই শ্রীলঙ্কায় মূলত দুই রকমের মুখোশনাচ আছে, কোলাম এবং সানি ইয়াকুমা। শ্রীলঙ্কায় প্রচলিত 'কোলাম' জনপ্রিয় একটি নৃত্য শৈলী, যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে একটি নাটকের উপস্থাপনা করা হয় অর্থাৎ 'কোলাম' 'নৃত্য ভিত্তিক নাটক' হিসেবেই বিবেচিত হয়। এই নৃত্যানুষ্ঠানে একাধিক চরিত্র যক্ত থাকে এবং প্রত্যেক চরিত্রের জন্য নৃত্যশিল্পীগণ আলদা আলাদা মুখোশ পরিধান করেন। মুখোশগুলি তৈরি হয় প্রত্যেক চরিত্রের আবেগ ও অভিব্যক্তি অনুযায়ী।

শ্রীলংকার দ্বিতীয় জনপ্রিয় মুখোশ নাচ হল সানি ইয়াকুমা, যা শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ অংশে (low country) প্রচলিত একটি মুখোশ নৃত্য। এখানে 18 ধরনের অসুখ সারানোর উদ্দেশ্যে 18 ধরনের সানি অপদেবতা বা পিশাচের কথা বলা হয়েছে। এই অপদেবতাদের পৃথক পৃথক নাম আছে এবং মনে করা হয় বিবেকহীন এই পিশাচগণ প্রত্যেকে আলাদা আলাদা অসুখের জন্য দায়ী এবং ইচ্ছে করলে তারা রোগ নির্মূল করতে সক্ষম। নৃত্য শিল্পীগণ অপদেবতার সমরূপ প্রদর্শনের জন্য কালো পোশাক, পাতার কারুকার্য করা স্কাট পরিধান করেন এবং সেইসঙ্গে পরা থাকে সুনির্দিষ্ট অপদেবতার মুখাবয়ব সদৃশ মুখোশ। শ্রীলংকার প্রচলিত মুখোশ নৃত্যগুলো অত্যন্ত আচার রীতিনীতি ভিত্তিক। শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি সৃষ্টিকারী অশুভ আত্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পরিবেশিত হয় বলে একে শয়তান তাড়ানোর নৃত্য সহজ উচ্চারণের জন্য শয়তানের নৃত্য (Devil dance) বলা হয়।

অন্যদিকে ছৌ ভারতের রাঢ় অঞ্চলে (ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা) প্রচলিত জনপ্রিয় মুখোশ নৃত্য। এই নৃত্য পরিবেশিত হয় বিশেষ করে চৈত্র পার্বণ এর বসন্ত উৎসবে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় একটি বাৎসরিক কৃষিচক্রের সমাপন ঘটে এবং পরবর্তী নতুন কৃষি চক্রের সূচনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় ছৌ উদযাপিত হয় সূর্য উৎসবের সময়। পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে 2010 সালে, ইউনেস্কোর প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় এই নৃত্য শৈলী উৎকীর্ণ হয়েছে মানবতার স্পর্শনাতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (An Intangible Cultural Heritage) হিসেবে। নিঃসন্দেহে এই স্বীকৃতি রাঢ় বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহৎ আকারের মুখোশ পরিধান পুরুলিয়া ছৌ এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শিল্পীগণ, অভিনীত চরিত্রগুলোর মুখোকৃতি বিশিষ্ট মাটির তৈরি বড় আকারের মুখোশ পরিধান করেন। মুখোশগুলি বেশিরভাগ পুরাণে বর্ণিত হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিরূপ। মূলতঃ স্থানীয় কিংবদন্তি, গল্পগাথা এবং হিন্দু মহাকাব্য যথা- রামায়ণ এবং মহাভারতের বিভিন্ন পর্বই হল ছৌ- নাচের বিষয়বস্তু 'পাইকা' এবং 'নাটুয়া' নাচ (বিশেষভাবে পুরুলিয়া শৈলীর ক্ষেত্রে) ছৌ নাচের অগ্রদূত হলেও, 'নাচনি' নৃত্য ছৌ নাচের বর্তমান পরিচিতি দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পালন করেছে। রাত্রিবেলা ঢোল, ধামসা, মহুরী ও সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কেবলমাত্র পুরুষ নাচিয়েরাই ছন্দোবদ্ধ লোকনৃত্যটি পরিবেশন করে। একটি খোলা স্থানে যাকে 'আখড়া' বা 'আসর' বলা হয়, সেখানে সামরিক কলাকৌশল, মল্লক্রীড়া, শরীরচর্চা প্রভৃতি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন থেকে এই নৃত্যের ব্যাপ্তি ঘটেছে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রাপ্ত ধর্মীয় বিষয়সহ একটি কাঠামোবদ্ধ নৃত্যশৈলীতে।

Lyer ও অন্যান্যরা [18] গ্রামীণ ভারতের সর্বসাধারণের ভোগ্যপণ্যের প্রাপ্যতা অনুযায়ী সামাজিক বিভাজনের উপর তিনটি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উৎসের প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করেছেন, যথা- (ক) ঔপনিবেশিক শক্তি, (খ) জমি ভোগ দখলের প্রচলিত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জমিদার-কৃষক পারস্পরিক সম্পর্ক এবং (গ) হিন্দু জাতিপ্রথা অনুযায়ী সামাজিক ভেদাভেদ ও বৃহদাকার ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণির উপস্থিতি। 1991 সাল থেকে সাধারণের ভোগ্যপণ্যের একটি উপাত্ত (data) ব্যবহার করে তারা খোঁজ পেয়েছেন যে প্রাক-স্বাধীনতা কালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনস্থ অঞ্চল এবং যেখানে জমিদারদের হাতে কৃষি সংক্রান্ত শক্ত কুক্ষিগত ছিল, এই দুই অঞ্চলে সর্বসাধারণের কাছে পণ্য সামগ্রী কম পৌঁছাতো। উচ্চ পর্যায়ের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস যুক্ত এলাকায় যেমন দেখা যায়। জমিদারহীন এলাকা এবং সামাজিক ভেদাভেদ যুক্ত এলাকা উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল পুরাতন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, মানে পণ্য সামগ্রী বণ্টনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নি। অ-ব্রিটিশদের ফলাফলও আশ্চর্যজনকভাবে স্পষ্ট ব্রিটিশ (জমিদার) এলাকাগুলি উল্লেখযোগ্য ভাবে খারাপ পণ্য বিতরণ করেছিল অ-ব্রিটিশ এলাকার তুলনায়। তথ্য, ঐতিহাসিক প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক পরিবর্তনশীল পদ্ধতির (instrumental variable approach) সঙ্গে একত্রে এই নিরীক্ষিত সম্পর্কগুলোর বিষয়ে lyer -দের

নিঃসংশয় করে তোলে। যেহেতু বাংলা এবং শ্রীলংকা তে ব্রিটিশ রাজের প্রাধান্য ছিল, সামাজিক কাঠামোর মিল গড়ে উঠেছিল এই দুই অঞ্চলে।

Anh [19] ভারত এবং শ্রীলংকা এই দুটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশের তুলনা করেছেন। ভারত পৃথিবীর জনসংখ্যার দিক থেকে চীনের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং 3,287,263 km2 বৃহদায়তন এলাকা জুড়ে এর বিস্তৃতি, অন্যদিকে শ্রীলংকা ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র, যার এলাকা প্রায় 65,610km2। কয়েক শতক ধরে এই দেশটি 'ভারত মহাসাগরের মুক্তো' নামে পরিচিত ছিল, এর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে এবং একই ইতিহাসের অংশীদার হিসেবে ভারত এবং শ্রীলংকার মধ্যে বহু সাদৃশ্য বর্তমান যেমন, উভয়ই গণতান্ত্রিক দেশ এবং দুটি দেশেই একসময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল, উভয় দেশেই ইংরেজি স্বীকৃত ভাষা এবং শিক্ষা, বাণিজ্যিকও বৈজ্ঞানিক কার্যাবলীতে এই ভাষা বহুল ব্যবহৃত। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, দুটি দেশই নিম্ন-মধ্য আয় সম্পন্ন গোষ্ঠী হিসেবে শ্রেণিভুক্ত এবং বিশ্বের প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের অনেকেই এই দুই দেশের অধিবাসী। দক্ষিণ এশিয়াতে থাকা সত্ত্বেও, ভারতে সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং চিন্তাধারার পার্থক্য এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তাই হঠাৎ করে দেখতে গেলে বাংলা এবং শ্রীলংকার মধ্যে মিল পাওয়া খুবই আশ্চর্যের এবং তা আধুনিক জিন সংক্রান্ত পঠনপাঠন ও গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে পেরে বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাসের এক নতুন দিক নির্দেশ করেছে।

সামাজিক ইতিহাস: বাংলা এবং শ্রীলংকার পারস্পরিক দূরত্ব বেশ অনেকটা এবং তাদের মধ্যে সামাজিক কোন যোগাযোগ নেই, তবু সামাজিক ব্যবহার এবং তার ইতিহাসের সাদৃশ্য দেখে চমৎকৃত হতে হয়। উদাহরণ হিসেবে সমাজের যুবগোষ্ঠীর কথা এখানে বলা হলো। বাংলার নকশাল এবং শ্রীলংকার এল.টি.টি.ই উভয়ই ছিল প্রশাসন বিরোধী ক্ষোভ থেকে সৃষ্টি হওয়া সংগঠন এবং প্রশাসনের দীর্ঘসময় লেগেছে এই ধরনের সংগঠনের মোকাবিলা করতে। বাংলা ও শ্রীলঙ্কা প্রশাসনের এই অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সংগঠনের সদস্যরা গেরিলা কায়দার যুদ্ধ কৌশল অনুসরণ করে। বেশিরভাগ যুবসমাজ থেকে আসা সদস্যরা শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। কিভাবে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা হয়েছে? এবিষয়ে Mehra র [20] লেখা থেকে জানা যায় যে, বাংলা এবং শ্রীলংকার গেরিলা যুদ্ধ সাধারণ অধিবাসীদের মানসিকতার বিরুদ্ধে হয়েছিল। এই অধিবাসীদের জিনগত সাদৃশ্য থাকায় তারা এই সংখ্যালঘুদের ওপর সকলে মিলে একই ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবহার করেছিলেন বলেই হয়তো এই বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভারতের বিপ্লবী কৃষকরা সেখানে বলেছেন যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামন্ত শ্রেণির বিলোপের জন্যই শুধুমাত্র গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে। শ্রেণি শত্রু ধ্বংস বলতে কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের বিলোপ সাধন বোঝায় না, শ্রেণি শত্রুর সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্তাব্যক্তির বিলোপ সাধনও বোঝায়। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলন গণতন্ত্রের প্রশ্নে সংবেদনশীল নয়, যদিও তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা তাদের প্রভাবিত অঞ্চলের ভোটারদের কাছেই সীমাবদ্ধ। আজকের দিনে আন্দোলনটির অস্তিত্ব যেভাবে টিকে আছে তা হ্যতো সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলনের চেহারা ধারণ করবে না। এটা যদি উপলব্ধি হয় তাহলে গবেষণামূলক কিছু প্রশ্ন ওঠে যেমন আন্দোলনটিকে কি দেশের ছোট ছোট একাধিক ক্ষুদ্র এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে? ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার ভেতরে কোথায় এবং কিভাবে এই আন্দোলন নিজের অবস্থান নির্দেশ করছে? বিশ্বে সাম্যবাদের ভয়ানক পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করে এই আন্দোলন জনপ্রিয় প্রতিনিধিত্ব পুনর্গঠন এর পরিকল্পনা কিভাবে করে? প্রকৃতিগতভাবে আন্দোলনটি কি প্রতিনিধিত্বমূলক? যতক্ষণ না আন্দোলনের নেতৃবর্গ এই প্রশ্নগুলোর প্রতি যত্নবান হচ্ছেন, ততদিন দ্বন্দ্ব উদ্রেককারী একটি সম্ভাব্য উৎস হিসেবেই এই আন্দোলন থেকে যাবে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যার কোনো প্রকৃত প্রভাব থাকবে না। নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের অনুকূলে একটি অর্থপূর্ণ আন্দোলনের পরিবর্তে নিস্ফলা ও দিশয়াগীন সন্ত্রাসের গতিই বৃদ্ধি পাবে এবং সেভাবেই আন্দোলনটি থেকে যাবে? বাংলার নকশাল আন্দোলনের অনুরূপ এল টি টি ই-র সন্ত্রাস মূলক কার্যকলাপ দেখা যায় শ্রীলংকাতেও।

Flanigin [21] এর মতে শ্রীলংকার সরকার বিরোধী এল টি টি ই-র আক্রমণাত্মক সামরিক তৎপরতা শুরু হয় 1970 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে। এর উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার সংখ্যালঘু তামিলদের জন্য একটি স্বাধীন জন্মভূমি বাঃ 'ইলাম' প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত স্বাধীন শ্রীলঙ্কায় দশকের পর দশক ধরে তামিলদের প্রতি অনুসৃত বৈষম্য এবং বঞ্চনাই তাদের সরকার বিরোধী ক্ষোভের মূল কারণ (Reuter [22])। একদা সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলিরা তামিলদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেয়, তামিলদের অসামরিক অধিকার লোপ করা হয়, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তামিলদের বহিষ্কার করা হয় (Wilson [23], Manogaran [24]। তামিল বিরোধী বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্রমশ সংগ্রামের আকার ধারণ করে এবং বিভিন্ন ভাবাদর্শে বিশ্বাসী সংগঠনগুলির একই ধরনের লক্ষ্য অর্থাৎ তামিল 'ইলাম' বাঃ তামিলদের নিজ বিরোধী বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্রমশ সংগ্রামের আকার ধারণ করে এবং বিভিন্ন ভাবাদর্শে বিশ্বাসী সংগঠনগুলির একই ধরনের লক্ষ্য অর্থাৎ তামিল 'ইলাম' বাঃ তামিলদের নিজ ভূমি গড়ে তোলার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। 1980 সালের মাঝামাঝি থেকে প্রায় 2000 এর কাছাকাছি সময় পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় যে তামিল বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব ছিল, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল এল টি টি ই তামিল টাইগাররা। তারা উপলব্ধি করেছিল, যারা তাদের প্রতি সমর্থনশীল তাদের বাধিত করতে হবে সামাজিক সমর্থন লাভের জন্য। জনসমষ্টির সমর্থন আদায়ের জন্য এল টি টি ই দের একটি প্রচেষ্টার সফল হয়েছিল। সেটা হল, এল টি টি ই নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলির স্বাস্থ্য এবং সামাজিক পরিষেবাগুলি যেন এল টি টি ই'ব তরফ

থেকেই পায়। এল টি টি ই তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিল। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার গোষ্ঠীগুলির সেবামূলক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য তারা পরিশ্রম সিদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে, নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠন এবং শ্রীলঙ্কা সরকারের পরিষেরা প্রদানকারী সংস্থাগুলিতে পরিচালন কমিটি নিয়োগ করে। এইভাবে কল্যাণকারী রাষ্ট্রের কাছে একটি প্রকাশ্য ভাবমূর্তি তৈরি করে এল টি টি ই নিশ্চিত করে যে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জনসমষ্টি তাদেরকেই প্রাথমিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রদানকারী হিসেবে দেখছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে এল টি টি ই সেনাপতিরা এল টি টি ই –র পক্ষ ত্যাগ করেছে বা যে বহু সংখ্যাক তামিল গৃহযুদ্ধের কষ্টের দরুন বিরক্ত হয়েছে এল টি টি ই'র প্রতি অথবা এল টি টি ই'র অনুগামী নয়, এমন বহু সংখ্যক তামিলকে হত্যা করা হয়েছে (Devotta [25])। একথা অনস্বীকার্য জনসমাজের সমর্থন বজায় রাখাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে। এই সন্ত্রাস বিশ্বাসী ক্ষোভ দুই অঞ্চলের মিল দেখায়।

Ahuja এবং Ostermann [26] মনে করেন জাতির গন্ডির উপস্থিতি, বৈবাহিক ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের বিষয়টিতে বাধা সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক উন্নয়ন হিসেবে নগরায়ণ এবং যুব সমাজের আয়তন বৃদ্ধি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বহুমুখী করেছে। উর্ধ্বাভিমুখী গতিশীলতার আকাঙ্ক্ষা এবং উপার্জনের জন্য অসবর্ণ বিবাহ প্রতি আগ্রহ গভীর হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি শহুরে সমাজের সামাজিকতায় সম্পৃক্ত হয়েছে, ফলে বিভিন্ন জাতি ভিত্তিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক দূরত্ব পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাচ্ছে। সেই জন্য বলা যেতে পারে, বড় ধরনের জিনের মিশ্রণ ঘটে চলেছে এবং তার ফলে 'নিউরো-হিস্ট্রি' ইতিহাস অধ্যয়ন আরো কঠিন হবে।

অর্থনৈতিক ইতিহাস: বস্ত্র শিল্প- কারখানা গঠন, বস্ত্রের উৎপাদন তথা বাণিজ্যে বাংলাদেশের উপস্থিতি খুবই সুদৃঢ়। বস্ত্র তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কাজের প্রকৃতি হল দীর্ঘক্ষণ একটি ঘরের আবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বারবার একই কাজের পুনরাবৃত্তি। বাঙালি ও সিংহলী দের আচরণগত বৈশিষ্ট্য এই ধরনের কাজের উপযুক্ত। IPS সংবাদ, জানুয়ারি 2021এর [27] রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের 20% বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় 2020 সালে মোট রপ্তানির 40% ছিল বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত পণ্য, যা সেখানকার মোট জাতীয় উৎপাদনের 6% (Hamza [28]।

Ahmed [29] এর গবেষণা দেখায়, বাংলাদেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বস্ত্র উৎপাদন কারখানায় যে শ্রম বিভাগ, তাতে কর্মীদের বৃহত্তম অংশই মহিলা কর্মী। কারখানার মালিকগণ বর্ণিত হয়েছেন, হয় আধুনিক অর্থনীতির ঝুঁকি গ্রহণকারী উদ্যোক্তা হিসেবে, অন্যথায় সেই সমস্ত নারী, যারা কারখানায় নামমাত্র মজুরিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, তাদের উৎপীড়ক হিসেবে। এই মহিলা মজদুর শ্রেণির সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করেছে-কিভাবে মহিলাদের উপার্জন পরিবারে নারী –পুরুষের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। বস্ত্র-কারখানার শ্রমিকদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ছবি অঙ্কিত হয়েছে। শ্রমিকদের শ্রেণিভেদে যে শ্রমের অর্থ ভিন্নরূপ, এই উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে কিভাবে পরিবারে নারী-পুরুষের ভূমিকা দৈনন্দিন অভ্যস্ত কাজ কে প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যদিও 1971 সালে যুদ্ধ পরিস্থিতি যে প্রাক-আধুনিক পুঁজিবাদী শ্রেণি তৈরি করেছিল এবং 1975 সালে সামরিক শাসন কালে গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি সমূহ তাদের বর্তমান পুঁজিপতি শ্রেণি গড়তে সক্ষম হয়েছিল, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির মহিলাদের ক্ষেত্রে কাজের অর্থও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এবং এই অনুভূতি পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত মহিলাদেরকেই বেশিরভাগ নিয়োগ করা হয় তার কারণ, তাদের সহজেই বাধ্য শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়। কারখানাগুলি ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন শ্রেণিবিভাজন কারখানার শ্রমিক দলের সংহতি প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে এবং শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠার সম্ভাবনাক অনেক বেশি কঠিন করেছে। বস্ত্র শিল্পে শ্রীলঙ্কাতে পুরুষের থেকে মহিলাদের অবদান তিন চতুর্থাংশেরও বেশি এবং এই অনুপাত অন্য শিল্প থেকে অনেক বেশি।

কিছু একক (single) মহিলা উপার্জনের দরুন নিজেদের ক্ষমতা বাঃ অধিকার উপলব্ধি করলেও বেশিরভাগ বিবাহিত মহিলারা তাদের অধিকার গড়ে তোলার বৃহত্তর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিজেদের উপার্জনের অর্থ বিনিয়োগে অক্ষম, কিন্তু পারিবারিক কল্যাণের জন্য এই আয় আবশ্যক এবং মহিলাদের এই কাজগুলি প্রয়োজন। যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নেতাগণ রাষ্ট্রের নীতি সুপারিশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তারা বস্ত্র- কারখানা চত্তরে কর্মরত মায়েদের কাজের সময় তাদের সন্তানদের দেখভালের জন্য শিশু দেখভাল কেন্দ্র (Creches) গড়ে তোলার ব্যাবস্থা, উপার্জনের আংশিক সঞ্চয় এবং কাজ থেকে অপসারিত কর্মীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন নির্ধারিত কাজের মানদণ্ড এবং বিশ্বে প্রচলিত বেতনকাঠামোর উপরও জোর দিয়েছেন।

Saxena [30]-র মতে শ্রীলংকা এবং বাংলার প্রাচীনতম রপ্তানিকৃত পণ্য সামগ্রীর শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হল কাপড় ও বস্তু উৎপাদন বিভাগ। বলা যেতে পারে বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ এশিয়ার শিল্পোদ্যোগের সূচনা ঘটিয়েছিল কাপড় ও বস্ত্র উৎপাদন বিভাগ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে (global south countries) শ্রমিকদের কর্মচ্যুত হওয়ার ভীতি দূর করার জন্য উত্তরের দেশগুলো (Northern Countries) Multi- Fiber Arrangement (MFA) গড়ে তোলে 1974 সালে। এই চুক্তির মাধ্যমে উন্নত দেশ যথা- আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে কাপড় ও বস্ত্র রপ্তানির অংশ নির্দিষ্ট ভাবে বন্টন করার মাধ্যমে রপ্তানি সীমাবদ্ধ করা হয়। MFA-র অস্তিত্ব ছিল প্রায় 30 বছর, 2005 সালে পর্যায়ক্রমে এর অবসান ঘটে।

2005 সালের (MFA-র পর্যায়ক্রমিক অবসরের সময়) পূর্বের অধিকাংশ গবেষণায় অনুমিত হয়েছে যে, এই সুনির্দিষ্ট অংশ বা ভাগ ব্যবস্থা তুলে দিলে অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলি বাজারে বহুলাংশ তাদের শরিকানা হারাবে। এই হতাশা মূলক ধারণার প্রধান কারণ ছিল,

বিভিন্ন ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী গোষ্ঠীগুলি কখনও এই বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে একত্রিত ভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে না। বইটির উল্লেখযোগ্য পাঠ ছিল, এই গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজেদের স্বার্থের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তার সঙ্গে আপোষ করতে আগ্রহী হবে না। সেই সময়কালের গতানুগতিক জ্ঞানের বিপরীতে বেশকিছু অপ্রত্যাশিত দেশ যেমন কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকা শুধু যে MFA –র অস্তিত্বের অন্তিম সময়কাল পর্যন্ত টিকে ছিল তাই নয়, তারা গুরুত্বপূর্ণ উন্নতিও ঘটিয়েছিল, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শাসনে তাদের অধিকার বজায় রাখতে অনুমতিও দিয়েছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস।

Indian Express এর প্রবন্ধে রায়চৌধুরী [31] লিখেছেন যে শ্রীলংকার সংস্কৃতি, কলা, সাহিত্যের সাথে বাংলা এবং উড়িষ্যার অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব সময় থেকেই এই যগোযোগ চলে আসছে। অজন্তা গুহার দেয়ালচিত্রে বিজয় রাজার শ্রীলঙ্কা যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা আছে। রাজা বিজয় এর পূর্ব-পুরুষেরা কলিঙ্গ এবং বঙ্গ রাজ্যের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রাচীনকালে পালি ভাষার চর্চা বঙ্গ এবং শ্রীলংকা উভয় স্থানেই প্রচলিত ছিল। এই সংক্রান্ত বহু পুঁথি এখনো বিদ্যমান। পালি ভাষা এবং বৌদ্ধ ধর্ম এই দুই অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলা যায়।

আন্তর্জাতিক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব স্যান্যাল তাঁর বিখ্যাত বই "The Ocean of Churn"এ বলেছেন যে বাংলা এবং শ্রীলঙ্কায় সিংহের পুজো করা হয় অথচ এই দুই অঞ্চলেই সিংহের বসবাস নেই বা কখনো ছিলনা। সিংহ মা দুর্গার বাহন এবং সিংহের প্রতীক শ্রীলংকার অনেক কিছুতেই ব্যবহার হয়ে থেকে, যেমন শ্রীলংকার জাতীয় পতাকায় আমরা সিংহের ছবি দেখতে পাই এবং তা সাহসিকতার চিহ্ন হিসেবে। বাংলা ভাষায় 'পুরুষসিংহ' অথবা 'ব্রিটিশ সিংহ' এইসব প্রচলিত শব্দ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দুর্দান্ত অথচ সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে শ্রীলঙ্কায় ইন্দো-আর্য ভাষা বহনকারী প্রথম অধিবাসীগণ ছিলেন ভারতের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল থেকে আগত। তারপর খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পরবর্তী সময় থেকে শ্রীলংকা ও বাংলার মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল মগধের মাধ্যমে এবং বাংলা সাহিত্যে শ্রীলংকা ও বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ঐতিহ্যের কথা সংরক্ষিত আছে (Indian Express [31])।

সাহিত্য, কলা, ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনায় Ferreira [32] –র মতে সমাজবিজ্ঞানে আমরা সাধারণত সচেষ্ট থাকি মানুষের আদর্শ ব্যবহার সংক্রান্ত পঠন-পাঠনে এবং তিনি আরও মনে করেন যে ইন্টারনেট মানুষের ব্যবহারের এই আদর্শ গুলোর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তাই বুদ্ধিগত অনুসন্ধিৎসার প্রাথমিক স্তরে সমাজতাত্ত্বিক একটি কর্তব্যহল ইন্টারনেটের ফলে কি ঘটছে এবং কিভাবে তা বিভিন্ন জিনিসের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সেগুলো লক্ষ্য করা। পদ্ধতিগতভাবে ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রকৃতই এ বিষয়ে কিছু বাধ্যকারী পথে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মান উজ্জ্বল করতে পারে। Ferreira মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণায় এই ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলি অবলম্বন করবেন। তার কারণ, আধুনিক শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল বিষয়ে প্রত্যাশা আছে এবং এই প্রযুক্তিতে তারা অনর্গল বাকপটু। কিন্তু প্রায়শই সামাজিক ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিগুলো কিভাবে মূল্য দেওয়া হবে তা বোঝার ক্ষেত্রে জটিল চিন্তন দক্ষতার অভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর মতে আমাদের শিক্ষা এবং প্রযুক্তি বিষয়টি যুব সমাজের জন্য উপযুক্ত করতে হবে কারণ তারা ডিজিটাল প্রযুক্তির বিষয়ে আগের প্রজন্মের থেকে বেশি পটু।

এই জিনতত্ত্ব বেশ কিছু বছর আগে শুরু হয়। Fuller [33] 1951 খ্রিস্টাব্দে মানুষের জিন এবং ব্যবহারের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে বলে মত ব্যক্ত করেন এবং আন্দাজ করেন, আমাদের মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডতেও জিনের প্রভাব আছে। শব্দ ভিত্তিক যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের "basal ganglia" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Ackerman et al. [34])।

যেহেতু সিংহলি এবং বাঙালিদের জিনগত সাদৃশ্য আছে, মস্তিষ্কের এই শব্দের অর্থোদ্ধার করার অঞ্চলগুলিও একই রকম হবে করা যায় এবং তার প্রভাব ভাষার মধ্যে পড়েছে। কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের Pathirana অনেক উদাহরণ সহযোগে বাংলা এবং সিংহলি ভাষার সাদৃশ্যের বিবরণ দিয়েছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য এখানে দেওয়া হল। বাংলায় "স্নান করো" সিংহলি ভাষায় "স্নানায় করন"; বাংলায় "গান করো" সিংহলিতে "গায়ানয় করন"।

এছাড়া আছে এই ধরনের শব্দের ব্যবহার, যেমন 'University'র বাংলা হল 'বিশ্ববিদ্যালয়' এবং সিংহলিতে 'বিশভভিদ্যালয়' (vishvavidyala)। বাংলা এবং সিংহলি উভয় ক্ষেত্রেই বাক্যের গঠনরূপ হল "Subject-Object-Verb (Sov)", যেমন-" তুমি ভাত খাও"। কিন্তু ইংরেজিতে বাক্যের গঠনের রূপ হল "Subject –verb-Object (SVO)" অর্থাৎ "You eat rice". বাংলা এবং সিংহলি ভাষা কয়েক শতক ধরে উংরেজি ভাষার প্রভাবে ছিল, কিন্তু এই বাক্যের গঠন রূপ বদলায়নি। বাংলা এবং শ্রীলংকার স্লোগানের বাক্য গঠনেও মিল লক্ষ্য করা যায়, যেমন "জনতার সংগ্রাম চলছে চলবে"-"জনথা সংগ্রাময় চলনয়বে"।

Doley [35] আলোচনা করেছেন, ভারতবর্ষে 22 টি তালিকাভুক্ত ভাষা, 100টি তালিকাভুক্ত নয় এমন ভাষা এবং 1500 টি উপভাষা আছে। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই দেশটি ভাষা তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সীমানা অনুযায়ী তখন (2013) 28 টি রাজ্য ও 8 টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ভারতীয় সমাজের বহুত্ববাদী প্রকৃতি একানকার নাগরিকদের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের ব্যবহারে বহুত্ববাদের উত্থান ঘটিয়েছে। আন্তঃব্যক্তিগত যোগাযোগের সময় (বিশেষতঃ মৌখিজ ক্ষেত্রে) দুই বা ততোধিক ভাষার ব্যবহার ইতিমধ্যেই একটি প্রভাবশালী ঘটমান বিষয়, যদিও তা অঞ্চল-ভেদে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে কথা বলার

সময় ভাষার পরিবর্তন কেবলমাত্র নিছক অভ্যাসের ফলে নয়, এর পিছনে পরিবর্তনে সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়ও থাকে। ভারতীয় ভাষাসমূহের তালিকা প্রস্তুতি ছাড়াও রচনাটি অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়েছে কেন ভারতীয়রা একটি একক কথোপকথনে দুই বা কখনও তিনটি ভাষাতেও কথা বলে থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ এবং অংশগ্রহণমূলক নয় এমন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নথিভূক্ত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা ধরনের কথোপকথনের উদৃতাংশ দেওয়া হয়েছে রচনাটিতে এবং তা পরীক্ষা করেও দেখা হয়েছে যে দ্বিভাষিক বাঃ বহুভাষিকগণ যখন বিভিন্ন ভাষা বা উপভাষা ব্যবহার করছেন তখন একটি কোডশৃংখল সৃষ্টি করছেন, যেমন- ভাষা-1 থেকে ভাষা-2 এবং পুনরায় ভাষা-2 থেকে ভাষা -3 তে। এই প্রক্রিয়াটি বক্তার নিয়মিত উপস্থাপনার উপর ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে এই ভাষাগত শৃংখল হল সমাজে বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন। কথোপকথন চলাকালীন ভাষা নির্বাচন করা হয় মূলতঃ ভিন্ন ভিন্ন মৌখিক পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হলে। কারণ বক্তা মনে করেন যে, কোনো একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ নির্দিষ্ট কিছু ভাষাতে অপেক্ষাকৃত ভালো ও নিখুঁত ভাবে আলোচনা করা সম্ভব। বক্তা যে পরিবেশে বসবাস করে, সেখানের সামাজিক পরিবেশ থেকেই তিনি বিভিন্ন ভাষার ক্রিয়া-কলাপ সংক্রান্ত জ্ঞান আহোরণ করেন। তবে এক্ষেত্রে মজাদার বিষয়টি হল বক্তাগণ তাদের ভাষা বাছাইয়ের প্রভাবগুলি সম্পর্কে অবগত বা সচেতন থাকেন না। সাধারণত বাঙালিদের লেখায় বাংলা এবং ইংরেজির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, আবার সিংহলিদের লেখার মধ্যেও সিংহলী এবং ইংরেজির সংমিশ্রণ চোখে পড়ে (Kugathasan and Sumathipala [36] এবং তা গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক সময় এই লেখনির ধারা প্রবাহ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহার করে রচিত লেখনি থেকে বক্তার বা লেখকের মেজাজ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যা আজকাল সামাজিক বাণিজ্যিকী করণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

আজকের বাংলা এবং শ্রীলংকা, উভয় অঞ্চলেই সংস্কৃতিতে বৈচিত্র ও ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই প্রবন্ধে কিছু কিছু ঐতিহাসিক সামঞ্জস্য তুলে ধরা হল যেটা জিনগত সাদৃশ্যের সাথে ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা মনে করি, এই দুই অঞ্চলে এমন আরও অনেক কিছু ঘটেছে এবং এখনও ঘটে চলেছে যা জিনগত তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। উৎসাহী গবেষকদের এই বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা আমরা দিয়ে থাকতে পারলে আমাদের পরিশ্রেম সার্থক জানব।

উপসংহার: এই প্রবন্ধে জিনগত সাদৃশ্য থেকে উৎপন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। বাংলা অঞ্চল ও শ্রীলঙ্কাকে বেছে নেওয়া হয়েছে তুলনামূলক আলোচনার জন্য এবং ইতিহাসের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মধ্যে বর্তমান সাদৃশ্যগুলি পাঠকবৃন্দের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। 'নিউরো-হিস্ট্রি' ইতিহাস অধ্যয়নের একটি নতুন শাখা এবং এটি মানুষের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ব্যবহার থেকে ইতিহাস গড়ার সম্ভাবনা রাখে। ইতিহাস এবং অর্থনীতি বিষয়ক ঘটনার সামঞ্জস্য এই জিনগত সাদৃশ্য থেকে দেখা যায়। আরও দেখানো হয়েছে যে, হঠাৎ বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে সেক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে জিনগত সামঞ্জস্য আছে। যেমন ইংরেজদের আগমনের সময় এই দুই পরিবেশই বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম দিয়েছিল। বাণিজ্য সামগ্রী নির্বাচন করার বিষয়েও অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়, যেমন বাঙালি ও সিংহলি উভয়ই বস্ত্র শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং সফলতা পেয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে যে জিনের মিল থাকলেই সবকিছু একরকম হবে তা নয়, কারণ পরিস্থিতি এবং পরিবেশও প্রেরণাদায়ী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ইতিহাসের গতি পালটে দিতে পারে।

References:

1. Thiessen, D. D. (1971) Gene Organization and Behavior. Random House, NY, USA. ISBN0-394-31029-2
2. US Library of Congress, " Ethnic Groups ". http://countrystudies.us/sri-lanka/38.htm , Accessed: May 16, 2021.
3. Metspalu, M., Mondal, M., and Chaubey, G. (2018) "The Genetic Makings of South Asia," Current Opinion in Genetics and Development. pp. 128-133. Vol. 53.
4. Josh, J. (2015) " Racial Groups of India ". https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/racial-groups-of-india-1448688039-1 , November 28, 2015.
5. Reich, D., Thangaraj, K., Patterson, N., Price, A. L., and Singh, L. (2009) " Reconstructing Indian Population History,". Nature, Sep. pp. 489-494. Vol. 461. DOI:10.1038/nature08365
6. Renwick, C. (2016) " Biology, Social Science and History: Interdisciplinarity in Three Directions," Palgrave Communications, Feb. 09.

7. Serpa, S., Ferreira, C. M., and Santos A.I. (2017) " Fostering Interdisciplinarity: Implications of Social Sciences," International Journal of Social Science Studies, December 17, Vols. 5, no. 12 .
8. Moorjani, P., Thangaraj, K., Patterson, N., Lipson, M., Loh, P-R, Govindaraj, P., Berger, B., Reich, D., Singh, L. (2013) " Genetic Evidence for Recent Population Mixture in India," The American Journal of Human Genetics, September, Vol. 93, pp. 422-438.
9. Papiha, S. S., Mastana, S. S., Purandare, C. A., Jayasekara, R., and Chakraborty,R. (1996) "Population Genetic Study of Three VNTR Loci (D2S44, D7S22,and D12S11) in Five Ethnically Defined Populations of the Indian Subcontinent," Human Biology, Oct., Vol. 68, no. 5, pp. 819-835.
10. Kshatriya, G. K. (1995) "Genetic Affinities of Sri Lankan Populations," Human Biology, Vols. 67, no.6, pp. 843-866.
11. Staff Writer (2020), " What are Different Types of History. " April 8. https://www.reference.com/world-view/different-types-history-762fff36ef098d79 , accessed October 10, 2021.
12. Attanayake, C. (2019) "Sri Lankan Perspectives on the Bay of Bengal" , Journal of the Indian Ocean Region, Vols. 15, no. 3, pp. 356-362.
13. Silva, N. D. (2013) "Maritime Heritage of Lanka: Ancient Ports and Harbours", The National Trust-Sri Lanka, ISBN: 9550093077
14. Bharathi, N., Malghan, D., and Rahman,A. (2019) "Village in the City: Residential Segregation in Urbanizing India", IIM Bangalore Research Paper No. 588, April 24.
15. Selvarajah, C., Meyer, D., Jayakody, J., and Sukunesan, S. (2020) " Managerial Perceptions of Leadership in Sri Lanka: Good Management and Leadership Excellence as Foundation for Sustainable Leadership Capacity Building in Post- Civil War Sri Lanka," Sustainability, MDPI, Open Access Journal,February, Vol. 12(4), pp. 1-24.
16. Hossain, M. A. (2015) " Bangladesh in Diplomatic History: Experiencing an Inherent Discipline," Foreign Affairs Insights & Review (FAIR),. March, 24. https://fairbd.net/bangladesh-in-diplomatic-history-experiencing-an-inherent-discipline/ . Accessed: Oct 11, 2021.
17. Chhau Dance, https://en.wikipedia.org/wiki/Chhau_dance , accessed on Oct 11, 2021.
18. Iyer, L., Banerjee, A., and Somanathan, R. (2005) "History, Social Divisions and Public Goods in Rural India", Journal of the European Economic Association, Vols. 3, no. 2-3.
19. Anh, A. N. H. (2016), "Country Comparison Overview: India and Sri Lanka", October 07. https://blog.healyconsultants.com/country-comparison-overview-india-and-sri-lanka/ accessed on Oct 11, 2021.
20. Mehra, A. K. (2007) " Naxalism in India: Revolution or Terror?", Terrorism and Political Voilence, December, pp. 37-66. Vols. 12, no. 2.
21. Flanigan, S.T. (2008) "Nonprofit Service Provision by Insurgent Organization: The Cases of Hizballah and the Tamil Tigers," Studies in Conflict & Terrorism, June, pp. 499-519,. Vols.31, no. 6.
22. Reuter, C. (2004) "My Life is a Weapon: A Modern History of Suicide Bombing", Princeton University Press, ISBN: 0691117594
23. Wilson, A. J. (2000) "Sri Lankan Tamil Nationalism", UBC Press, ISBN: 9780774807609.
24. Manogaran, C. (1987) "Ethnic Conflict and Reconciliation in Sri Lanka", University of Hawaii Press, ISBN: 082481116X.
25. DeVotta, N. (2004) "Blowback: Linguistic Nationalism, Institutional Decay, and Ethnic Conflict in Sri Lanka", Stanford University Press, ISBN: 0804749248.

26. Ahuja, A. and Ostermann, S. L. (2013) "Crossing Caste Boundaries in the Modern Indian Marriage Market," SSRN. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2273324 .
27. Sabir, U. (2021) “The Rise of Bangladesh’s Apparel and Textile Industry,” IPS News, January 6, https://ipsnews.net/business/2021/01/06/the-rise-of-bangladeshs-apparel-and-textile-industry/accessed on Oct 11, 2021.
28. Hamza, M. (2020) “Sri Lanka Apparel Exports to Lose US$1.5bn as Coronavirus Cripple Buyers”, https://economynext.com/sri-lanka-apparel-exports-to-lose-us1-5bn-as-coronavirus-cripple-b uyers-63205/ accessed Oct 11, 2021.
29. Ahmed, F. E. (2004) "The Rise of the Bangladesh Garment Industry: Globalization, Women Workers, and Voice," National Women's Studies Association(NWSA) Journal, Vols. 16, no. 2, pp. 34-45.
30. Saxena, S. B. (2014) " Made in Bangladesh, Cambodia, and Sri Lanka: The Labor Behind the Global Garments and Textiles Industries,"Cambria, 2014. [Online] Available: https://www.cambriapress.com/pub.cfm?bid=597 accessed on Oct 11, 2021.
31. Roychowdhury, A. (2020) “Yes, the Sinhalese have Their Origins in Bengal, Odisha”, The Indian Express, May, https://indianexpress.com/article/research/yes-the-sinhalese-have-their-origins-in-bengal-odis ha/ accessed on Oct 11, 2021.
32. Ferreira, C. M. (2019) " Sociology and Digital Culture," International Journal of Social Science Studies, May, Vols. 7, no. 3.
33. Fuller, J. L. (1951) “Gene Mechanisms and Behavior”, The American naturalist, May-June, Vol. LXXXV, No. 822.
34. Ackermann, H., Hage, S.R., Ziegler, W. (2014) “Brain Mechanisms of Acoustic Communication in Humans and Nonhuman Primates: An Evolutionary Perspective” Behavioral and Brain Sciences, 37, 529-604. doi:10.1017/S0140525X13003099.
35. Doley, R. K. (2013) "Languages in India and Their Mixed Use: A Sociolinguistic Study," GRA-Global Research Analysis. June.
36. Kugathasan, A., Sumathipala, S. (2020) “Standardizing Sinhala Code-Mixed Text Using Dictionary Based Approach”, 2020 International Conference on Image Processing and Robotics (ICIP). doi: 10.1109/ICIP48927.2020.9367353.